এই সকল প্রধান সমস্যার পাশাপাশি আরো বহু ছোট ছোট সমস্যা ছিল যেগুলি সম্যক সমাধান ছাড়া দেশের শান্তি ও প্রগতি সম্ভব ছিল না। এদের অন্যতম হল, জমিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভূমিহীনদের দুঃখদুর্দশা মোচনের পথ নির্দেশ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির অধিকার ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরিবর্তে সহনশীলতার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং একটি দক্ষ ও কার্যকরী বিদেশ নীতি রূপায়ণ করা, ইত্যাদি। পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে স্বাধীন ভারত সরকার এই বহুবিধ সমস্যার সমাধানে লিপ্ত থেকে দেশকে ভবিষ্যতে সুসংগঠিত ভারত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার দিশা দেখাতে সচেষ্ট ছিল।

উদ্বাস্তু সমস্যা ও পুনর্বাসন :

দেশ বিভাগের অনিবার্যতা সম্পর্কে বিতর্ক চলছে। কয়েক শতক হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক জীবনধারা সক্রান্ত দাবি। বিশেষ করে পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব এবং হিন্দু নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত দেশ বিভাগ মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য বিকল্প ছিল না। ভি. পি. মেননের বিশ্লেষণ অনুসারে মূলত দুটি কারণে জাতীয় কংগ্রেস দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিল।[1] প্রথমত, মুসলিম লিগের আপস বিরোধী মনোভাব থেকে স্পষ্ট হয়েছিল যে, ঐক্যবদ্ধ ভারত পেতে হলে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হবে এবং গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হবে। দ্বিতীয়ত, এমনটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হবে, যা এতকাল ভারতীয় রাজনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে এবং প্রগতিশীল কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করেছে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভারত ও পাকিস্তান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করবে, এমন প্রত্যাশাও কংগ্রেসের ছিল। তবে এহেন প্রত্যাশার বাস্তাবতার দিকটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। নর্মান ডি. পামার লিখেছেন, "ব্রিটিশরা যদি আরো দীর্ঘদিন ভারতে অবস্থান করত তাহলেও মুসলিম লিগ একটি মাত্র ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনে সন্তুষ্ট থাকতো কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"[2]

বাস্তবে দেশ বিভাগের পরিণাম ছিল অতি তিক্ত। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বন্ধের পরিবর্তে তা বিভৎসরূপে বারবার আবির্ভূত হয়ে সারা সমাজকে দগ্ধ করেছে। রক্তের স্রোতে ভেসেছে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দেহ। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দুটি অভাবনীয় ঘটনা বৃহত্তর তাৎপর্য সহ গ্রাস করেছে ভারতের রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে। এগুলি হল, কাশ্মীরে পাকিস্তানের প্ররোচনায় স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ এবং ১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারি নতুন দিল্লীর বিড়লা ভবন প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভা পরিচালন কালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকান্ড। মহারাষ্ট্র হিন্দু মহাসভার জনৈক উগ্র সমর্থকের হাতে 'জাতির জনকে'র এই হত্যাকান্ড সর্বসাধারণের মনে হতাশা ডেকে আনে এবং 'জাতি গঠনের' অব্যবহিত পরেই জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর সংশয় দেখা দেয়। শোকসন্তপ্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই প্রসঙ্গে আকাশবাণীর এক ভাষণে বলেছিলেন '.... আমাদের জীবনের আলো নিভেছে এবং সর্বত্রই শুধু অন্ধকার।..... এই আলো দেশকে বহু বছর কাল আলোকিত করেছে, আগামী কয়েক বছর আলোকিত রাখবে এবং হাজার হাজার বছর পরেও এই আলো দেশে দেখা যাবে, পৃথিবী তা দেখবে এবং অসংখ্য মানুষকে সান্ত্বনা দেবে।' স্বাধীনতার প্রাক্কালে নিজের আত্মজীবনীতে গান্ধীজি লিখেছিলেন 'দাসত্বমুক্তি ও স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক দুর্বলতা সমূহ প্রকাশ্যে চলে আসবে। তবে এজন্য অকারণে আশাহত হওয়ার দরকার নেই। এই মুহূর্তে আমরা যদি চিন্তা ও কর্মের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি, তাহলে সকল জট মুক্ত হওয়া যাবে।' ইতিহাসের পরিহাস এমন যে, গান্ধী নিজের জীবনদানের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য প্রমাণিত করে গিয়েছেন।[3]

1. V.P. Menon-*The Transfer of Power in India (1957), P-440.*
2. পামার-ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা (১৯৯০), পৃঃ ১১৮।
3. সিলেক্টেড ওয়ার্কস (খন্ড-৪৪) পৃঃ ২।

Norman D. Palmer, The Indian Political System

দেশ বিভাগের তাৎক্ষণিক পরিণাম ছিল ভয়াবহ। যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরাময়ের সম্ভাব্য উপায় হিসেবে দেশ ভাগ মেনে নেওয়া হয়েছিল, তা শীঘ্রই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। স্বাধীনতার আনন্দোৎসব শীঘ্রই ম্লান হয়ে যায় তীব্র সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ড ও লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বহারা হওয়ার ঘটনায়। এই ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে প্রকাশিত গ্রন্থে **শ্রী মেনন** লিখেছেন, 'একথা সত্য যে অবস্থাটা ভীতিকর ও অমঙ্গলপূর্ণ ছিল। কিন্তু এটা আশাতীত যে এত তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হবে।'[1] লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের প্রাক্কালে গান্ধীকে বলেছিলেন যে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, রক্তপাত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করার জন্য সমস্ত রকম প্রয়াস নেওয়া হবে।[2] জাতীয় কংগ্রেস ও লিগ নেতৃবৃন্দও নিশ্চিত ছিলেন যে, দেশ বিভাগের পরে যে সকল অব্যবস্থা দেখা দেবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হবে না। কিন্তু দেশভাগের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের নৃশংস হত্যাকান্ড এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সমস্ত পূর্বাভাস ও প্রত্যাশা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। ১৯৫৯ সালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পন্ডিত নেহরুও এই ভ্রান্তির কথা স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, 'দেশ বিভাগের পর এই ভয়াবহ হত্যাকান্ড ঘটতে পারে, তা আমাদের ভাবনার বাইরে ছিল। বরং বলা যায় আমরা একে এড়ানোর জন্যই দেশ ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এজন্য আমরা দুভাবে মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছি। প্রথমত, রাজনীতি ও মতাদর্শের দিক থেকে এবং দ্বিতীয়ত, বাস্তাবক্ষেত্রে যা আমরা এড়াতে চেয়েছিলাম তার দিক থেকে।'[3]

স্বাধীন ভারত সরকারের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও তার সমাধান। দেশ ভাগের পরে সংখ্যালঘু বিদ্বেষের বিষ বাষ্প পাকিস্তানের আকাশ বাতাস এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে সেই শ্বাসরুদ্ধকারী পরিবেশে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব ছিল না। সরকারি মদতে মুসলিম জাতীয় রক্ষীবাহিনীর (আনসার) অত্যাচারের শাসনে অসহায় সংখ্যালঘুদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ (বা আত্মবিসর্জন) বা দেশত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাজনৈতিক দাবির পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের ওপর অর্থনৈতিক নিপীড়ন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নির্যাতন তাদের জীবন দুর্বিসহ করেছিল। তাই সবকিছু ছেড়েই তারা নিরুপায় হয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই সমস্ত পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করে প্রায় সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। 'দুই-জাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে দেশ বিভাগের মধ্যেই এই বিপর্যয় অন্তর্নিহিত ছিল। সব-হারানো এই সকল মানুষের পুনর্বাসন-ব্যবস্থার রূপায়ণ ছিল ভারত সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ বিশেষ। দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সমস্যার সমাধানের নীতি গ্রহণ করা হবে এটি প্রত্যাশিত ছিল। এগুলি হল মানবিক দৃষ্টি ও অর্থনৈতিক দৃষ্টি। কিন্তু স্বাধীন ভারত সরকার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে উদাসীনতা ও খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করতে থাকে। যদিও শ্রী মেনন লিখেছেন যে, সাম্প্রদায়িক হত্যা, উদ্বাস্তুদের গমনাগমন এবং যারা ভারতে আসছেন তাদের রক্ষণাবেক্ষন ও পুনর্বাসনের কাজ এতটাই বিশাল ছিল ইতিপূর্বে বিশ্বের অন্য কোন রাষ্ট্রকে যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তা ছাড়া, ভারত সরকারকে এমন একটা সময় এই কাজ করতে হয়েছিল যখন দেশভাগজনিত কারণে প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় অবিন্যস্ত অবস্থায় ছিল। একথা সত্য। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাবে চলে আসা উদ্বাস্তু এবং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলায় আসা উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে স্বাধীন ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যে এক ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে লেখা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর একাধিক পত্রের বক্তব্য থেকে সরকারের উদ্বাস্তু সক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া সম্ভব। নেহরু মনে করতেন যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু চলে এলে তার কোন যুক্তিসিদ্ধ সমাধান করা সম্ভব হবে না। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন যে উদ্বাস্তুদের আগমন

1. মেনন - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪১৭।
2. *Moulana A. K. Azad-India wins Freedom, 1959, P-190.*
3. পামার - পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২০।

Scanned by CamScanner

বন্ধ করার জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'সম্পত্তি ও জনবিনিময় নীতি' মেনে নেয়। এই নীতি মোতাবেক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাব, দিল্লি, হরিয়ানা অঞ্চলে আগত উদ্বাস্তুদের সমসংখ্যক মুসলমানকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুরা তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির বিনিময়ে অন্যপক্ষের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করতে সরকার অস্বীকার করে। পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর সমসংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে জনসংখ্যার সমতা রক্ষা করার দাবি উঠলে নেহরু ক্ষুব্ধ হন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, কোন মানুষ মুসলমান হলেই অভারতীয় নয়। অন্যত্র কিছু লোকের দুর্ব্যবহারের কারণে কোন ভারতীয় নাগরিক গোষ্ঠীকে দেশের বাইরে ঠেলে দেওয়া আইন সম্মত বা ন্যায়নীতি সঙ্গত নয়। এই ব্যবস্থা ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতির মূলে কুঠারাঘাত করবে বলেই নেহরু মনে করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার চুপচাপ বসে থাকেনি। ১৯৪৯-এর শেষ দিকে সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ হাজার। মহিলা ও শিশুদের বাদ দিলে প্রায় ৬২,৫০০ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া জরুরি ছিল। রাজ্য সরকার ১৯৪৮-এর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং অ্যাক্ট' (Act XXI of 1948)-এর সাহায্যে পুনর্বাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চালায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অসংখ্য শরণার্থীদের যে ক্ষুদ্রতম অংশটি সরকারি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, মূলত তাদের জন্যই জমি অধিগ্রহণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও উদ্যোগী শরণার্থীরা নিজ নিজ উদ্যোগেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। আবার সম্পন্ন নয়, কিন্তু উদ্যোগী-এমন কিছু শরণার্থী পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত জমি-বাড়ি দখল করে শারীরিক শ্রম দিয়ে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। ১৯৪৮-এর জমি অধিগ্রহণ আইন পাশ হওয়ার মুহূর্তে সরকারি ত্রাণশিবিরে প্রায় সাড়ে একুশ হাজার শরণার্থী ছিলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানি ও পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিমুখী নীতির আভাস পাওয়া যায় পন্ডিত নেহরুর পত্রাবলীতে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি লিখেছিলেন যে, হয়তো পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য কম অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তবে এটিকে আদৌ পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ফল বলা সঠিক নয়। কারণ পরিস্থিতির উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। দেশভাগের আগেই পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে দশ লক্ষের মত লোক পাঞ্জাবে চলে এসেছিল। তাদের কোনো সাহায্য করা হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা এসেছে খেপে খেপে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হয়েছে। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানে বহু হিন্দু থেকে গিয়েছে। পন্ডিত নেহরু পরামর্শ দেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন এখন কোন ব্যবস্থা না নেয় যাতে উদ্বাস্তুরা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার উৎসাহ পায়। পন্ডিত নেহরু এই পত্রে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে এলে ভয়াবহ দুর্দশার সৃষ্টি হবে যার মোকাবিলা করা কোনো সরকারের পক্ষেই সম্ভব হবে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরাও এই সকল ছিন্নমূল মানুষের চরম দুর্দশার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। মার্কাস ফ্রান্ডা[1] (Marcus Franda) -র বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সমকালীন সাহিত্য ও শিল্পে উদ্বাস্তুদের দুর্ভাগ্যের প্রতিফলন তেমন ভাবে ঘটানোর প্রয়াস দেখা যায়নি। কেউ কেউ এঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের ঘাটতির জন্য এঁদের দায়ী করেছেন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বলি এই সকল অসহায় মানুষদের প্রতি বাঙালি তথা বঙ্গবাসীর সহানুভূতি উদ্রেকের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উদ্বাস্তুদের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে, 'রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হারানোর ভয়ে তোমরা শঙ্কিত হয়ো না। রাজনৈতিক দালালি বা নির্বাচন ব্যবস্থার নিপুণ ব্যবহার করে যা অর্জন করেছো, তা এদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভয় পেয়ো না। তোমাদের রক্তে এই নতুন রক্ত মেশাও'।[2]

1. *মার্কাস ফ ান্ডা - র‍্যাডিক্যাল পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল (M. I. T : Prio. USA). পৃ: ৩৮।*
2. *প্রফুল্ল চক বর্তী - প্রান্তিক মানব (১৯৯৭) পৃ: ২৪।*

১৯৫০-এর গোড়ায় দাঙ্গা-পরিস্থিতি পুনরায় ভয়াবহ আকার নেয়। পূর্ববঙ্গের খুলনা, বরিশাল ও অন্যান্য জেলায় হিংস্র অত্যাচারের ফলে অসংখ্য মানুষ চলে আসতে বাধ্য হয়। এবারে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল নমশূদ্র শ্রেণী। পশ্চিমবঙ্গেও পাল্টা দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৫০-এর উদ্বাস্তু প্রবাহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোকে প্রায় ভাঙনের মুখে ঠেলে দেয়। রাজ্য সরকার বনগাঁ ও দর্শনাতে অস্থায়ী শিবির তৈরি করে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়। এদের 'বাস্তুহারা' সার্টিফিকেট দিয়ে স্থায়ী সরকারি ক্যাম্পে থাকার অধিকার প্রদান করা হয়। এই সার্টিফিকেট **'Boarder Slip'** নামেও অভিহিত হত। উদ্বাস্তু সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাক্সেনা কলকাতায় এক বৈঠক ডাকেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি মেঘনাদ সাহার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই বৈঠকে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অনাগ্রহের ছবি পুনরায় ফুটে ওঠে। এখানে পুনর্বাসনমন্ত্রী সাক্সেনা জানিয়ে দেন যে, নতুন উদ্বাস্তুদের কেন্দ্রীয় সরকার 'ত্রাণ দেবে, পুনর্বাসন নয়।' কেন্দ্রীয় সরকার ধরে নিয়েছিল যে, পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা বন্ধ হলেই উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবে। আশ্চর্যজনক ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সমস্ত উদ্বাস্তুকে গ্রহণ করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। জন বিনিময় ও সম্পত্তি বিনিময় দ্বারা পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে কিছুটা সহনশীলতা দেওয়া হয়। অথচ পশ্চিম বাংলা তথা পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে সাময়িক কালের পর পরিস্থিতি শান্ত হলে সবাই (বাঙালি) ফিরে যাবে। ড. মেঘনাদ সাহা সহ বাংলার প্রতিনিধিদের তীব্র প্রতিবাদ ও আবেদন সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিচারিতামূলক সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

১৯৫০-এর দাঙ্গা এবং ব্যাপক উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঐ বছর এপ্রিলে নেহরু-লিয়াকত্ আলি চুক্তি (দিল্লিচুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে দুদেশের উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তারা দেশে যে অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে চলে এসেছিল তার সম্পূর্ণ মালিকানা ফিরে পাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি পালিত হলেও, পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে হয়নি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যের দেশত্যাগী মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি একত্র করে কেন্দ্রীয় সরকার একটি ক্ষতিপূরণ ভান্ডার গঠন করে। এই সম্পত্তির সাথে সরকার আরও একানব্বই কোটি টাকা যুক্ত করে প্রায় একশো একানব্বই কোটি টাকার সম্পত্তি আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করে। এস্টিমেটস্ কমিটি (Estimates Committee)-এর ৮৯তম প্রতিবেদন[1] থেকে বোঝা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত ১ লক্ষ ৩১ হাজার ১৭৩ টি পরিবারের জন্য পরিবার পিছু ১ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছিল। এর বাইরে সরকার নিজ উদ্যোগে কিংবা উদ্বাস্তুদের সহায়তায় প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার আবাসন তৈরি করে দেয়। অন্য দিকে পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের আবাসন তৈরির জন্য গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সরকারি অনুদানের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ১২০০ টাকা। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার দ্বারা নির্মিত বাড়ির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ও ১১ হাজার। এহেন বৈপরীত্য সত্যই পীড়াদায়ক। পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯টি উপনগরী নির্মাণ করেছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে কোনো উপনগীর তৈরি করা হয়নি। পাঁচটি উপনগরীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ ছিল। কেবল অশোকনগরে একটি উপনগরীর কাজ শুরু হয়েছিল, যার হতদরিদ্র পরিকাঠামোর সাথে পশ্চিমাঞ্চলের উপনগরীর কোনো তুলনাই চলে না। উদ্বাস্তুদের চাকুরিদানের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রকাশ দেখা যায়। পুনর্বাসন সংক্রান্ত রিভিউ কমিটি (Committee of Review of Rehabilitation work in West Bengal) প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ২ লক্ষ ৪ হাজার উদ্বাস্তুকে চাকুরি দেওয়া হয়েছিল। ট্রান্সফার ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় আরও ৮০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তু চাকুরি পেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হল মাত্র ১ লক্ষ ১০ হাজার।

1. *Extimate Committee, 1959-60. Eighty-Nineth Report (2nd Lok Sabha). P-3*

Scanned by CamScanner